থনটন কাকা

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

রজনীবাবুদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে সেদিন ছোটখাটো একটা সাহিত্যিক বৈঠক ছিল। তর্ক, আলোচনা ও প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে সন্ধ্যা বেশ ভালোই কাটল। রজনীবাবু বর্তমানে সাত-আটটা বড় কয়লাখনি, বর্ধমান জেলার জমিদারি ও সিংভূম জেলার শালবন ও মৌজার মালিক; এসব বাদে কলকাতায় বাড়ি জমি তো আছেই নানাস্থানে।

রজনীবাবু বললেন—বসুন, বসুন। বেশি রাত হয়নি এখনো। পৌঁছে দেব এখন গাড়িতে। একটা গল্প বলি। আমার তখন বয়েস নবছর। আমাদের বাড়ি বর্ধমান জেলার বনপাশ স্টেশন থেকে দুক্রোশ দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে। গ্রামের বাইরে অবধি মাঠ, শুধুই ধান হয় সে মাঠে, মাঠের মাঝখানে বড়বড় তালগাছে ঘেরা সেকেলে দিঘি, তার নাম 'গলাকাটা পুকুর'। বহু আগে যখন ওসব দেশের ওইসব তেপান্তর মাঠে নির্বান্ধব পথিকদের গলা কেটে ডাকাতেরা লাশ বেমালুম দিঘির জলে পুঁতে রাখত, তখন থেকে ওই নামে চলে আসছে দিঘিটা।

একবার রোদপোড়া মাঠে চৈত্র-দুপুরে আমি আর গ্রামের দুটি ছেলে মাছ ধরছি, হঠাৎ একটি ছেলে তার নাম হবু, রামচন্দ্র সাবুই-এর ছেলে, আজও মনে আছে—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ও কে—ওই দ্যাখ—

—কে রে? কই, কোথায়?

—ওই তো বসে।

তার পর সবাই মিলে কাছে গিয়ে দেখলাম তালগাছের তলায় এক সাহেব বসে; তার পরনে অতি জীর্ণ ও মলিন তালি দেওয়া প্যান্টালুন, তেমনি কোর্ট, তেমনি জুতো।

আমরা কাছে যেতে সাহেব কি একটা বললে, আমরা বুঝতে পারলাম না। যে সময়ের কথা বলছি, তখন একজন সাহেবকে ও অবস্থায় অজ পল্লীগ্রামে দেখা খুব একটা আশ্চর্য বিষয় ছিল। আমরা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছি, এমন সময় সাহেবটা আবার কি যেন বললে।

হরু বললে, ও খেতে চাইছে ভাই।

আমারও তাই মনে হল।

আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে বললাম—আমার সঙ্গে এসো। সেই সাহেবকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলাম।

বাবা অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি মাইনর স্কুলের সেকেন মাস্টার। আমাদের বাড়িতে দু-তিনটে ধানের গোলা ছিল, চল্লিশ বিঘে ধানের জমি ছিল পুকুরে মাছ ছিল, জিনিসপত্রও তখন সস্তা ছিল। সংসার ভালোই চলত, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল না।

বাবা সাহেবকে বাইরের ঘরে একটা টুলের ওপর বসালেন। চেয়ার ছিল না আমাদের বাড়ি। ইংরেজিতে কি কথা তার সঙ্গে বললেন। তার পর আমাকে বললেন, বাড়ির মধ্যে যা, তোর দিদিকে গিয়ে বল গে এক বাটি মুড়ি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে। সাহেব খাবে।

আমি কিছু আশ্চর্য হয়েই দিদিকে গিয়ে কথাটা বললাম। আমার মা এ সময় খুব পীড়িত, আমার ছোটো ভাই বিনয় তখন সবে মাস খানেক হল কি হল জন্মেছে, মার শরীর সেই থেকেই খারাপ। দিদি কাঁসার বড় জামবাটিতে মুড়ি দুধ আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখে আমার হাতে দিয়ে বললে, কেমন সাহেব রে?

—ভালো সাহেব।

—চল আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে আসি।

আমার দিদির নাম ছিল বীণা, আমার সে দিদি মারা গিয়েছে বহুদিন।

বাবার মুখে সব শুনলাম। সাহেব আসছে বরাকর থেকে, গরিব, ওর কেউ কোথাও নেই। বাবার কাছে আশ্রয়। চেয়েছে। বাবা বলছেন, থাক। তবে আমাদের ঘরে যা জোটে তাই খেতে হবে।

সাহেব তাতেই রাজি হয়েছে।

সেই থেকে সাহেব আমাদের বাড়িই রয়ে গেল। গাঁয়ের লোক দলেদলে আসতে লাগল সাহেবকে দেখতে।

আমারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতাম, ওই তো সাহেব বসে আছে—

বাইরের ঘরে সাহেব থাকতো, কৃষাণের জন্যে একটা ছোটো তক্তপোশ পাতা ছিল সেখানে অনেক দিন। সেইখানে পুরনো তোশক ও থলের চট, একখানা পুরনো চাদর ও একটা বালিশ, একটা ছোটো মশারি দিয়ে সাহেবকে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন বাবা। একখানা লোহার কলাই-করা সান্‌কি আর একটা কলাই-করা গেলাস—এই আমরা দিয়েছিলাম ওকে, তাতে সে ভাত খেত।

সাহেবের নাম ছিল থর্নটন। আমার মুখে ভালো উচ্চারণ হত না, আমি বলতাম থনটন কাকা। কেউ বলত ঠনঠন সাহেব।

আমাদের যা রান্না হত, থনটন কাকাকে তাই দেওয়া হত। দিদি এসে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, থনটন কাকা খেতে জানে না, মাছের ঝোল আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখেছে!

ওর কথা শুনে আমি গেলাম দেখতে। সে এক কাণ্ডই করেছে সাহেব। ডাল খায়নি, অথচ মাছের ঝোলে তালের গুড় দিয়ে মেখে চুমুক দিচ্ছে।

বললে ও, ইট ইজ সো হট!

কথাটা আমি স্পষ্ট বুঝলাম—ফার্স্ট বুক পড়ি, মানে করলাম, ইহা হয় এত গরম?

কিন্তু গরম—তাই কি? তালের গুড় মাখলে কি গরম কমবে?

পরে বাবা বলেছিলেন—ওর মানে, খুব ঝাল। মাছের ঝোল খুব ঝাল হয়েছিল। হয়ই আমাদের বাড়িতে।

বাবা বলেছিলেন সাহেবের তরকারিতে ঝাল কম দিতে।

আমি আর দিদি ওকে খেতে শেখালাম—কিসের পর কি খেতে হয়, কেনা জিনিসটা কিভাবে মাখতে হয়। থনটন কাকা আমাদের, বিশেষত দিদিকে, বড় ভালোবাসতে শুরু করলে। ক্রমে একটু-আধটু বাংলাও শিখে ফেললে আমাদের কাছে।

দিদিকে বলত অদ্ভুত বাঁকা সুরে বী-ণা, ডাল ডেও! বাট ডেও নো—ডাল ডেও!

দিদি হাসতে হাসতে বলত—ভাত দেব না কাকা?

—নো। বাট ডেও নো—ডাল ডেও।

—বেগুনভাজা দেব? এই যে—এই দেব?

—নো।

থনটন কাকা বুড়ো লোক, পরে আমরা আবিষ্কার করলাম। সাহেব লোকের বয়স প্রথমটা আমরা বুঝতে পারিনি।

আমাদের সে তাসের খেলা শেখাত বাদলার দিনে বসে বসে। আমাকে ইংরেজি পড়াত বটে, তবে তার বাঁকা বাঁকা জড়ানো উচ্চারণ আমি প্রথমটা বুঝতেই পারতাম না। একদিন বাবাকে বললাম—বাবা, সাহেবকাকা ইংরেজি জানেন না।

—সে কি!

—কি রকম বলে, হাসি পায়।

—ও যা বলে, ওই ঠিক উচ্চারণ। আমাদের মুখেই হয় না। ও ঠিক বলে। ও যা বলে তাই শিখবি।

থনটন কাকা আমাদের গাঁয়ে পুরনো হয়ে গেল। রামায়ণ গানের আসরে, কবির আসরে সাহেব গিয়ে বসত সকলের সামনে। করুণ গান শুনে হয়তো খুব হাততালি দিলে হাসিমুখে—এই রকম বুঝত।

একখানা মোটা বই বের করে মাঝে মাঝে পড়ত। বাবা বলতেন, ও বইকে বলে বাইবেল। সাহেবদের ধর্মপুস্তক।

সন্ধের সময় ডাকতো—বীণা—

দিদি এসে বলত—কি থনটন কাকা?

—খাটে ডাও।

—এখনো রান্না হয়নি। মুড়ি দেব?

—নিয়ে এসো। টেল নো।

—না, তেল দেব না। গুড় দেব?

—গুড় ডাও।

এইভাবে দুবছর কাটল আমাদের বাড়িতে। তখন সে বেশ বাংলা শিখেছে, এমনকি নিজের নাম বাংলায় লিখত—জেমস থরনটন।

আমি বললাম—ও কাকা, ভুল হয়েছে। থরনটন কি, থর্নটন হবে। এই দ্যাখো একে বলে রেফ, এই বসাও। এবার হল থর্নটন।

—নো নো রেফ অ্যান্ড অল দ্যাট। এই ডেখ—

—বেশ দেকি—

সাহেব লিখল—থরনটন—

আমার দিকে চেয়ে বললে, ঠিক?

—না ঠিক না, এই দ্যাখো—

—ও হ্যাং হোক—আমি লিখব, টোমার রেফ আমি লিখব না।

—লিখো না। লোকে বলবে থরনটন—

—লেট দেম! বলটে ডাও।

—দিলাম।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে তাড়াতাড়ি সব আম পেকে গেল। আমি বললাম—থনটন কাকা, আম পেড়ে নিয়ে আসি চলো পুকুরধারের বাগান থেকে।

—আমি সব পাকা আম খাব।

—খেও। লগা নিয়ে চলো, আম পাড়তে হবে।

কিন্তু আম পাড়তে যাবার আগে পিওন এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, পড়তে পারো? এ বোধ হয় সাহেবের চিঠি!

থনটন কাকাকে চিঠিখানা দিলাম। চিঠিখানা পেয়ে হঠাৎ ওর মুখ কেমন হয়ে গেল। সেখানেই খুলে পড়ল। পড়ে কি সব বলতে লাগল ইংরেজিতে! আর নড়ে না, ওঠেও না। কখনো আপনমনে হাসে, কি বিড়বিড় করে বলে। রাতে বাবার কাছে শুনলাম থনটন কাকা অনেক টাকা পাবে বিলেতে। ওর এক খুড়ি না পিসি ছিল, সে মারা গিয়েছে, ও তার সম্পত্তি পেয়েছে। বিলেতের উকিলেরা চিঠি লিখেছে।

মাসখানেক মধ্যে থনটন কাকা দেশে চলে গেল।

তার পর যে কথাটা বলবার জন্যে এ গল্পটার অবতারণা সেটা এখন বলি।

যাবার কিছুদিন আগে থনটন কাকা বাবাকে বললে—আমার তুমি অনেক উপকার করেছ, তোমার একটা উপকার আমি যাবার সময় করব। আমার সঙ্গে এক জায়গায় চলো, রেলে যেতে হবে।

বাবা গেলেন।

বরাকর নদীর কাছাকাছি কোনো একটা পাহাড়ের তলাকার শালবন আর লাল কাঁকুরে মাটির ডাঙা দেখিয়ে সাহেব বলেছিল বাবাকে—সমস্ত বাংলাদেশের কয়লার ক্ষেতের মধ্যে প্রথম শ্রেণির কয়লা আছে এই জমির তলায়। আমি মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। কেন আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, কেন এমন অবস্থায় পড়েছিলাম, সে কথা তোমাকে জানাব সময়মতো। এখন আমার পরামর্শ, এই জমি বন্দোবস্ত নাও কিংবা কেনো। কেউ জানে না এর তলায় কি অমূল্য সম্পদ লুকানো। আমার কথা অবিশ্বাস কোরো না। একদিন ভেবেছিলাম নিজে আমি এই জমি কিনে নেব বা বন্দোবস্ত নেব। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা আমার ঘটল না। তার জন্যে দুঃখিত নই। তুমি আমাকে নিজের ঘরে নিজের সহোদর ভাইয়ের মতো স্থান দিয়েছিলে, তার খানিকটা প্রতিদান দিতে পেরে আমি খুশি হয়েছি। আমার কথা শোনো, বড়লোক হয়ে যাবে। বীণার বিয়েতে যৌতুক দিলাম এই জমি। কাউকে এসব কথা বলবে না। ঘুণাক্ষরেও না। তা হলে সব যাবে।

বাবা বাড়ি এসে মায়ের গহনা বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার চলে গেলেন বরাকরে।

সন্ধান নিয়ে জানলেন নিকটবর্তী পালনডি মৌজার ডিহি পাঁচপুর কাছারির জমিদার গঙ্গারাম মাহাতোর দু-আনি অংশের জমি ওটা। কলকাতার গৌরমোহন পাল দিগর বর্তমান মালিক।

গেলেন কলকাতায় জমিদারের বাড়ি। গৌরমোহন পাল দিগরের নায়েবকে কুড়ি টাকা ঘুষ দিলেন। নায়েব নকশা ও কাগজপত্র দেখে বললে—এ জমি বহুকাল থেকে পতিত। এ আপনি কি করবেন?

নায়েবের সুরের মধ্যে যেন সন্দেহের রেশ রয়েছে।

বাবার বুক কেঁপে গেল। মনের অগোচরে পাপ নেই। বাবা বললেন—চাষ-বাস করব।

ঘুঘু নায়েব হেসে বললে-সে কি মশাই? পাথুরে ডাঙায় কি চাষ হবে? চাষের জমি হলে এতকাল ও জমি পতিত থাকে? তা ছাড়া ওর ত্রি-সীমানায় জল নেই। কিসের চাষ করবেন?

—গরু-মহিষ পুষব, চাষ করব, বাসও করব, সব রকমেই—

নায়েব চোখ মিটকি মেরে বললে—আমায় কি দেবেন?

—কেন গরিবের ওপর জুলুম করবেন? আপনাকে খুশি করব—

—কত?

—একশো টাকা

—না, ওতে হবে না।

—দেড়শ?

—না।

—কত বলুন?

—দশ হাজার টাকা। পাঁচ বছর পরে। নগদ দিতে হবে না। লেখাপড়া করুন। এরা কলকাতার বড়লোক, এরা কি জানে মশাই, আমি আন্দাজে বুঝেছি। তবে আপনাকে নগদ দিতে হবেনা। একটি কর্জনামার খত রেজিস্ট্রি করা থাকবে, বুঝলেন? যেন আপনি দশ হাজার টাকা ধার নিলেন আমার কাছ থেকে।

—সে হবে না। রেজিস্ট্রার টাকার লেনদেন নিজের হাতে করবে। দশ হাজার টাকা কে দেবে!

—তার ব্যবস্থা হবে। সব রোগের ওষুধ আছে।

জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল।

তবে আমরা জমিদারকেও ফাঁকি দিইনি। এখন সে জমির আয় বার্ষিক নিট দেড় লক্ষ টাকা।

জমিদারের নাবালক ছেলেকে আমরা দু-হাজার টাকা ফি বছর দিই।

আমাদের যা কিছু দেখছেন, সব সেই পালনডি কয়লার খনি থেকে। এখন আমাদের দশটা কোলিয়ারি, কোনোটাই কিন্তু পালনডির মতো নয়। পালনডি লক্ষ্মীর ঝাঁপি। থনটন কাকার ছবি দেখবেন? চলুন পাশের ঘরে। না, আসল ছবি বা ফটো নয়। আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকিয়েছি। আমি চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলাম, অবিশ্যি যতটা মনে ছিল।

রজনীবাবু গল্প শেষ করলেন। বললেন—চা খান আর একবার।

আমি বললাম—সাহেবের আর কোনো খবর পাননি?

—কিছুনা। আমার মনে হয় যাওয়ার পথেই মারা গিয়েছিল। নইলে অন্তত বীণা দিদির খবর সে নিশ্চয় নিত। চলুন থনটন কাকার অয়েল পেন্টিং দেখাই। থনটন কাকা ভাঙা লোহার সনকিতে ভাত খাচ্ছে, এই ছবিটাই আঁকিয়েছি। আসুন এই ঘরে।